রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুচিন্তিত, বিশ্লেষণাত্মক ও হৃদয়গ্রাহী সমালোচনা। রবীন্দ্র সমসাময়িক ও রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্য-কবিতার বিশ্লেষণে ও ঐতিহাসিক মূল্যায়নে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সমগ্র আলোচনাটিকে বুদ্ধদেব বসু চারটি অংশে বিভক্ত করেছেন। আলোচনার শুরুতেই 'স্বভাবকবি' বলে যে একটি কথা প্রচলিত আছে, সেই কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। গোড়াতেই তিনি গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্পর্কে 'স্বভাবকবি' বিশেষণটিকে সমর্থন করেছেন এবং যে ব্যক্তি এই আখ্যাটি দিয়েছিলেন, তিনি যে এটি গোবিন্দচন্দ্র দাসের ক্ষেত্রে খুব নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন সেটাও তিনি বলেছেন। একদা রবীন্দ্রনাথ 'নীরব কবি' কথাটিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা টিকে গেছে। স্বভাবকবি কথাটা শুনলে মনে হয়—যার স্বভাবে কবিত্ব আছে, সেই স্বভাবকবি। কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। স্বভাবে যার কবিত্ব, সেই স্বভাবকবি—এমনটা নয়। তাহলে কাকে 'স্বভাবকবি' বলা যায়? স্বভাবকবি তাঁকেই বলে "যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যার মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিন সম্বন্ধ।" কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবি মাত্রেই হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রাণে যা আসবে তাই লিখে যাব। হৃদয়কে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে না শিখলে তা নিছক আবেগই থেকে যায়। কিন্তু ব্যক্তির আবেগকে সাধারণীকরণ করতে হলে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে। আর এই উত্তরণ তখনই সম্ভব, যখন তাকে বুদ্ধির শাসনে বাঁধা হয়। কিন্তু এই শাসন করতে পারার শক্তি সবার থাকে না। যাদের থাকে না, তাদের কাছে যা পাওয়া যায়, সেটা হল কাঁচামাল, তা finished product নয়। লেখার বিষয়ে সচেতন চিন্তা যাদের নেই, যাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি নেই, তাদেরই বলা যায় 'স্বভাবকবি'। লেখক দু'ধরনের স্বভাবকবির উল্লেখ করেছেন—ব্যক্তিগত কারণে স্বভাবকবি এবং ঐতিহাসিক কারণে স্বভাবকবি। গোবিন্দচন্দ্র দাস খাঁটি অর্থে স্বভাবকবি। তিনি কখনই কাব্যের ক্ষেত্রে সংযত হতে জানতেন না। হৃদয়ের ভাবকে সাদামাটা গোটা গোটা প্রকাশ করাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। মনে যা আসে তাই লিখে যাওয়াটা স্বভাবকবিত্বের ধর্ম। আর এক্ষেত্রে গোবিন্দচন্দ্র দাস ফুল মার্কস্ পাবেন। শুধু তাই নয়, তিনি রবীন্দ্র সমসাময়িক হলেও

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব আদৌ অনুভব করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করলেই যে তাঁর স্বভাবকবিত্বের বদনাম ঘুচে যেত, এটা মনে করারও কোন কারণ নেই। কারণ রবীন্দ্রদীক্ষা পেয়েও স্বভাবকবিত্বের দুর্ঘটনা ঘটেছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সহ সমসাময়িক কবিদের কপালে। বুদ্ধদেব বসুর মতে—এর ফলে দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যে সব কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ সেইসময় যাঁরা বাংলা কাব্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের সেই সময়ের কপালের লিখনই ছিল স্বভাবকবিত্ব। কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রখর প্রতিভার দীপ্তিতে তখন চারদিক আলোকিত। সে আলোর রোশনাইতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন প্রভৃতি কবিরা এই সময় আবির্ভূত হন এবং রবিরশ্মির দ্বারা এমনভাবে গ্রস্ত হন, যাকে বুদ্ধদেব লোহার চুম্বকে সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনাটি অভ্রান্ত। চুম্বকের কাছে এলে লোহা যেমন অবশভাবে আকর্ষিত হয়, ঐ কবিকুলও তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভার জাদুস্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব এটাকে ঐ সময়ের কবিদের 'বিধিলিপি' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

"বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে।" কেন? কিসের সংকট? ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার মধ্যগগনে বিরাজ করছেন। পূর্বের বাংলা কাব্য থেকে তাঁর কাব্যের ফারাকটা এত বেশি যে সমসাময়িক কবিদের রবিবহ্নিতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই। বুদ্ধদেব বলেছেন—"কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে বসে ভোগ করা যায়, তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে পদে।" সমসাময়িক কবিকুল তাই খেই হারিয়ে ভেসে গেছেন। আর সেজন্যেই এদের বলা হয়েছে ঐতিহাসিক স্বভাবকবি। এদের রচনা এককথায় রবীন্দ্রনাথের তরলিত রূপ। এঁরা রবীন্দ্র-আলোককে আত্ম-আলোক বলে ভুল করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেনন কেন এমন হল? এটা কী ঐসব কবিদের শক্তির দীনতা? না। আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতার দীনতা এবং আত্মরক্ষা করার শক্তির অভাব। অবশ্য এজন্য তাঁরা দায়ী নন। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা এঁরা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক অনিবার্যতাবশত "তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।"

সূর্য থেকে আলোকরশ্মি গ্রহণ করে বৃক্ষের ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে ; সেই খাদ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণধারণের প্রধান

উপকরণ। তেমনি রবিরশ্মির কাব্যপ্রতিভার দীপ্তিকে অঙ্গীকার করে যে কটি কবিপ্রাণ বাংলা কাব্যকুঞ্জে ফুটে উঠতে চেয়েছিল, তারাই হল—যতীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, কিরণধন, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি কবিরা। বুদ্ধদেবের মতে সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের 'কুলপ্রদীপ'। যথার্থই এঁরা রবীন্দ্রের কাব্যকলার মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হয়ে মরূদ্যান ভ্রমে মরীচিকার পিছনে ছুটে পথভ্রান্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রের অনুপম কাব্যনির্মিতির স্বরূপ-সন্ধানে ব্রতী না হয়ে, তার বাইরের খোসাটাকে সম্বল করে তাঁরই চারপাশে উপগ্রহের মতো ঘুরতে থাকলেন। চুম্বক যেমন অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে টানে, রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সমসাময়িক কবিদের কাছে ছিল তেমনি সাংঘাতিক। সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করার শক্তি তাঁদের ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রের বড় কাছের। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বের বাংলাকাব্য এবং রবীন্দ্রকাব্য—এ দুয়ের মধ্যে যে আসমান-জমিন ব্যবধান, তাতে সমসাময়িক কবিগণ, বুদ্ধদেবের ভাষায়, "বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত"...। রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের মতো দীপ্তিমান, সে সময় যাদের আবির্ভাব এবং নজরুলের আগমনের পরে যাদের তিরোভাব সেই সময় কবিদের পারস্পরিক পার্থক্য বোঝা যায় না। তাঁদের কাব্যকলা আশ্চর্যরকম সমতোল, আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল এবং কবিতে কবিতে ভেদচিহ্ন এত অস্পষ্ট যে তাদের কাউকে পৃথকভাবে চেনা যায় না, একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া। বুদ্ধদেবের মতে—এর একমাত্র কারণ রবীন্দ্রনাথ। এই কবিরা রবীন্দ্রকাব্যকলায় মুগ্ধ হয়ে মতিভ্রমে পতিত হলেন। রবীন্দ্রের আপাতসরল রচনাকৌশলে তাঁরা স্বরূপহারা হলেন। আত্মশক্তি বিচার না করে মুগ্ধবিস্ময়ে বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো রবীন্দ্রকাব্যবহ্নিতে প্রাণমন সমর্পণ করলেন। ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্র স্তবক নির্মাণের নমুনা—তাঁরা পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁদের হাতে যেন স্বর্গ এসে গেল। কবিতা লেখা তাঁদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল। শুধুমাত্র ভাব আসার অপেক্ষা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতো করে লিখলেই হল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন। তাই "তাঁদের মধ্যে দেখা দিল সেই ফেনিলতা, সেই অসহায় অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুলক্ষণ।" এই অনুকরণের মোহে তন্দ্রাপ্লুতা হল তন্ময়তা, শৈথিল্য হল স্বতঃস্ফূর্তি। এই অনিবার্য অনুকরণের মোহে তাঁরা রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে সতর্ক করে দিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথের

ভাষাতেই—"বাহির হইতে দেখো না আমায়, দেখো না অমন ক'রে।" কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথরা রবীন্দ্রনাথকে শুধু বাইরে থেকেই দেখেছেন। তার কারণও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথে দান্তে, গ্যেটের মতো স্বর্গ-মর্ত্য-নরকব্যাপী কোন পরিকল্পনা নেই, শেক্সপীয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা নেই, মিলটনের মতো বাক্য বন্ধের ব্যূহরচনা নেই। তিনি যেন সহজ সরল জলের মতো। তিনি শব্দের আড়ম্বরে হাতের কাছে অভিধান রাখতে বাধ্য করেন না ; তাঁর বিষয়বস্তুও কোন বিরল দুষ্প্রাপ্য কিছু নয় ; বঙ্গ প্রকৃতি ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে চোখ মেলে মন খুলে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, সেটাই লিখেছেন। তাই বাইরে থেকে মনে হয় কবিতা লেখা—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা লেখা কত সহজ। আসলে সহজ হওয়া যে সহজ নয় এই সহজ সত্যটাই সহজে বুঝতে চাননি রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিগণ। রবিকবির কবিতা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। সেই প্রকাশের অনায়াস লাবণ্য কারো পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তুতে কবিপ্রাণের যে আবেগের চাপ, যে বিশ্বাসের তাপ আছে, তা শতবার পড়লেও পুরনো হয় না। প্রাণের তারে রিন্‌রিন্ করে বেজে ওঠে—নতুন করে জাগিয়ে তোলে নানান ব্যঞ্জনা। সেই প্রাণবন্ত প্রবলতা নেই রবীন্দ্রসমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে। থাকাটা সম্ভবও নয়। আসলে মনে হয়, তাঁদের অন্তরানুভবেই ঘাটতি আছে। যেন কবিতা লেখার জন্যেই লেখা ; তাই বড় কৃত্রিম ও পান্‌সে লাগে। রীতির দিক থেকেও এল ভঙ্গুরতা। রবীন্দ্রছন্দের মধুরতা, মদিরতা, অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম ও রুচি কোথায় উবে গেল—থাকল মিহি সুর ও বেলোয়ারি কাচের চুড়ির ঠুন্‌কো আওয়াজ ; যা শুধু কানে গিয়ে পৌঁছয়, প্রাণে নয়। রবীন্দ্রনাথে যা ছিল সাধনা ও সিদ্ধি, তাঁদের হাতে তা হয়ে উঠল লেখা লেখা খেলা বা শব্দ ও ছন্দোঘটিত ব্যায়াম বা ব্যায়রাম। বুদ্ধদেব বসু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বিষয়টা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ঃ

তুল তুল টুক টুক
টুক টুক তুল তুল
কোন ফুল তার তুল
তার তুল কোন ফুল
টুক টুক রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য ...।

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঃ

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী
পুলকিত চম্পার
লহো অভিনন্দন
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা
মাল্যের বন্ধন ...।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন এবং সার্থকভাবে বলেছেন প্রথমটি কেন কবিতা নয়, আর দ্বিতীয়টি কবিতা কেন। প্রথমটিতে আবেগের উত্তাপ নেই, অনুভূতির নিবিড়তা নেই ; নেহাতই যান্ত্রিক। তাই ছন্দটাও কচি ও কাঁচা ও বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে কবিহৃদয়ের আবেগ যেন প্রাণিত হয়ে বাইরে ছন্দোরূপ ও বাণীরূপ লাভ করেছে। তাই ওটি সার্থক কবিতা। এই প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করার ক্ষমতা—যা রবীন্দ্রনাথে আলোর মতো, হাওয়ার মতো, আকাশের মতো, সমুদ্রের তরঙ্গের মতো, সবুজ বনানীর মতো আপনা থেকে বিচ্ছুরিত হয়,—সে জিনিস রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিরা কোথায় পাবেন? ও জিনিস তো অনুকরণ করা সাধ্যাতীত। অথচ সেই চেষ্টা করতে গিয়ে রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিরা রবীন্দ্রনাথের ছেলেমানুষী সংস্করণকেই হাজির করলেন। এর ফলে কবি হিসাবে তাঁদের পৃথক অস্তিত্বই প্রায় লুপ্ত হল। এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অতলান্ত বিস্ময়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইলেন না, বরং রবীন্দ্রকাব্য তাঁদের হাতে পরিস্রুত হ'তে হ'তে প্রায় ঝুমঝুমি বা লজেঞ্চুসের মতো কবিতায় যখন পরিণত হল, তখন এই নির্দোষ, সুশ্রাব্য, অন্তঃসারশূন্য বদমালগুলোকে কালের করুণাময় সর্ম্মার্জনী মুছে দিল। তাই না হল অনুকরণ, না হল স্বীকরণ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণের অনিবার্যতা ছিল বাইরের দিক থেকে এবং অনুকরণের অসম্ভাব্যতা ছিল ভিতরের দিক থেকে।

আসলে সে সময় এরকমটা হওয়াই অনিবার্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে। কারণ কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের dimension এত ব্যাপক ও তার প্রকৃতি এত গভীর যে তা আপাতসরল সহজ ও স্বচ্ছ। কিন্তু ভ্রান্তিটা এখানেই। সেটা কী? সেটা হল এই যে বাংলাভাষায় কবিতা লেখার কাজটা পরবর্তী কবিদের কাছে কঠিন হয়ে গেল এবং সেজন্যেও দায়ী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লিখতে হলে এমন বিষয় বেছে নিতে হবে যা তিনি করেন নি।

প্রথমতো তিনি করেন নি এমন কাজ খুঁজে বার করা সে সময়ে ছিল প্রায় অসম্ভব। অথচ এছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথরা এইখানেই ভুল করলেন। তাঁরা বিপরীত পথে হাঁটলেন এবং সে পথ রবীন্দ্রনাথের পথ। সে পথে যাওয়া যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব, তাঁদের পক্ষে অসম্ভব—এটা তাঁরা বুঝলেন না। বরং রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, তাঁরাও সেটাই করতে চেষ্টা করলেন এবং তলিয়ে গেলেন। তাঁদের ধারণা হল কবিতা লেখা অতি সহজ, এরজন্যে কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, যেন ইচ্ছা করলেই কবিতা লেখা যায়। শুধুমাত্র একটু ভাব জাগার অপেক্ষা। এটাই তাদের ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির মোহে মজে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে রবিতাপে দগ্ধ হয়ে আত্মদান করলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অন্যনিরপেক্ষভাবে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। যেটা পাঠকের কাছে সুবিধাজনক আর কবির কাছে বিপজ্জনক। আসলে এ ধরনের কবিতা যে বাইরে থেকে আহরণ করা নয়, বরং ভেতর থেকে হয়ে ওঠা, এটা না বুঝলে কবির পক্ষে বড় বিপদ। কী সেই বিপদ? বিপদটা হল এই যে—রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, মানুষের অনুভূতি, মানুষের সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রকাশ এমন অসহ্যসুন্দর কবিতা হয়ে উঠেছে এবং এত সহজ সরল ও সোজাসুজি যে তার জন্য কোন আয়াস আছে বোঝা যায় না। এটাই কবিদের পক্ষে বিপদ। যার ভাল উদাহরণ সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে বেছে নেবার কারণ, অন্যান্য কবিদের থেকে রচনাশক্তিতে তিনি শ্রেষ্ঠ, যুগপ্রতিভূ এবং রবিকবির পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। কিন্তু তথাপি এটা মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে আর সত্যেন্দ্রনাথের কোন প্রয়োজন থাকে না। কেন থাকে না? আসলে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য কোন জাতের নয়, একই কাব্য আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ ও অনুজের নয়। অথবা বড় কবি ছোট কবির নয়। আসল বিচার্য বিষয় সত্যেন্দ্রনাথ খাঁটি কবি কিনা। না, তিনি খাঁটি কবি নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত সাজ সরঞ্জাম নিয়ে কারবার করতে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বস্তুর মধ্যে যে আবেগের ঘনত্ব, যে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা আছে, যা বারবার পড়ার পরও নতুন বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথে সেটা মনে হয় না, বরং মনে হয় মূল অনুভূতিটাই কৃত্রিম, জলো ও পানসে। বুদ্ধদেব বসুর মতে—"যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হলো দিবাস্বপ্নে, যে ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা হয়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হলো ভাবালুতা, সাধনা হলো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হলো লালপরী নীলপরীর

আমোদ-প্রমোদে।" রীতির দিক থেকেও এল ভঙ্গুরতা। সমস্ত ব্যাপারটা এক উদ্দেশ্যহীন কসরত এবং শব্দ ও ছন্দের ব্যায়ামে পরিণত হল।

এই সময়ের কবিরা অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা তথাপি পরবর্তী কবিকুলের কাছে নমস্য। কারণ রবীন্দ্রপ্রভাব রূপ ব্রহ্মাস্ত্রের ফাঁড়াটা তাঁরা বুক পেতে নিয়ে পরের কবিদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। সেইজন্যই সত্যেন্দ্র-কবিগোষ্ঠীর কাছে পরবর্তী কবিরা গভীরভাবে ঋণী। বুদ্ধদেব বসু আপন অভিজ্ঞতা থেকে যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—"কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল, আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তার বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার, আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভারতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।"

কেমন করে নজরুল এই মায়াজাল ছিন্ন করলেন? লেখক তো নজরুলকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছেন। কারণ পূর্বের কবিদের মতো নজরুলের মধ্যেও প্রকরণগত ছেলেমানুষী লক্ষ করা যায়। নজরুলের প্রেমের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দ ও আক্ষরিক প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায়। এতটা প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের ওপরও পড়েনি। নজরুলের ওপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও দুর্লক্ষ নয়। শুধু তাই নয়, নজরুলের কবিতা অসংযত, অসংবৃত, প্রগলভ এবং পরিণামহীন। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত নজরুল প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, কুড়ি থেকে চল্লিশ বছরের লেখায় কোন প্রভেদ নেই। তাহলে কী সেই বিশেষত্ব যা নজরুলের ছিল, যা তাঁকে সত্যেন্দ্রগোষ্ঠীর কবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে? সেটি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই একটি মাত্র গুণে নজরুলের সমস্ত দোষ ঢাকা পড়ে গেছে। নজরুল রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম মৌলিক কবি। হয়তো প্রতিভায় ক্ষুদ্র, কিন্তু নতুন। নজরুল রবিতাপের প্রখর প্রদাহ থেকে নিজেকে যে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, বলা যায় এটা একটা অসাধ্যসাধন। কিন্তু আশ্চর্য, এটার জন্যে নজরুলকে কোন সাধনা করতে হয়নি, কতকগুলো আকস্মিক কারণ এটাকে সম্ভব করেছিল। সে কারণ নিহিত আছে নজরুলের জীবনের ভিন্নতার মধ্যে। তিনি মুসলমান, কিন্তু হিন্দু মানসকেও আপন করে নিয়েছিলেন, চেষ্টা করে নয়, স্বভাবগুণে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে কোন শহরে নয়, মফস্বলে, স্কুল কলেজ ভদ্রলোক হবার শিক্ষায় নয়, যাত্রাগান লেটোগানের আসরে, রুটির দোকানে, তারপর সৈনিকের

ব্যারাকে। এইসব সামাজিক অসুবিধাগুলো কবিতা লেখার সময় নজরুলের কাছে সুবিধা হয়ে উঠল। এই ভিন্ন বন্য ধরনের পরিবেশ নজরুলকে পীড়িত না করে তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে আরো সবল করেছিল। আর এই সবলতার জন্যই কোনরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি ছাড়াই স্বভাবের জোরে রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নপথে যেতে পারলেন এবং বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চার করলেন। "তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো, সে-পরিমাণ পুষ্টি ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন ; ..... তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব।" নজরুল যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললেন, তাতে কাব্যক্ষেত্রে নতুন চাঞ্চল্য জাগল। যতীন সেনগুপ্ত, মোহিতলালের আবির্ভাব হল এবং সেই পথ ধরে 'কল্লোল'গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা সম্ভাবিত হল, যাকে বুদ্ধদেব বলেছেন— "বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।"

নজরুলের অসচেতন বিদ্রোহ সচেতন স্তরে উঠে এল 'কল্লোলে'র মাধ্যমে, যার প্রধান লক্ষণ হল বিদ্রোহ এবং অবশ্যই সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ রবীন্দ্রনাথ। "নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হলো।" নাবালক দশা কী? কীভাবে তার অবসান হলো?

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো বলা ও পরের ভঙ্গি নকল করে চলাই হল নাবালক দশা। যার মধ্যে কোন স্বকীয়তা নেই, নেই নিজত্ব বা মৌলিকতার স্পর্শ—সেই নাবালক। যে নিজে খেতে পারে না, নিজে হাঁটতে পারে না, যাকে খাইয়ে দিতে হয়, হাত ধরে হাঁটাতে হয়, সেই হল নাবালক। এককথায় মৌলিকতাহীন, পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণকারী, আত্মনির্ভরতাহীন মাত্রেই নাবালক। আলোচ্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, যথা—সত্যেন্দ্রগোষ্ঠী, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মাঝবয়সে উদিত হয়েছিলেন এবং নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর অস্তে গেলেন—তাঁদের কাব্যক্ষেত্রে 'নাবালক' বলে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কারণ এঁদের কাব্য সমতোল, আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, ক্রমবিকাশহীন কবিতে কবিতে ভেদচিহ্নরহিত, পান্‌সে ও জলো। এঁরা সবাই বিষয় ও প্রকাশরীতি উভয়ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। সোনার গয়না আর ইমিটেশান গয়নার যে তফাৎ, আসল ভ্রূ আর প্লাক করা ভ্রূ পেনসিল দিয়ে আঁকলে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, নারীমুখের সহজাত লাবণ্য, আর পেন্ট করা মুখের মধ্যে যে পার্থক্য হয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর সত্যেন্দ্রগোষ্ঠীর কবিতার মধ্যে সেই পার্থক্য পরিদৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ

সত্যেন্দ্রগোষ্ঠী রবীন্দ্রানুসরণ তথা অনুকরণ করতে গিয়ে আপন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিলেন এবং কাব্যকবিতার নামে রবীন্দ্রকাব্যের কিছু প্যারোডি করলেন। পরানুকরণসর্বস্ব, মৌলিকতাহীন এই বালখিল্যতাকেই বুদ্ধদেব 'নাবালক দশা' বলেছেন।

রবীন্দ্রসমসাময়িক অথচ রবীন্দ্র-পরবর্তী তিন কবি নজরুল, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল—সচেতনভাবে রবীন্দ্রপরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, তা নয় ; কিন্তু তাঁদের কাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে রবি-প্রভাবমুক্ত অন্যতর কাব্যচর্চার সূত্রপাত হল যা আর যাই হোক—রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ বা অনুকরণ নয়। কবি হিসাবে নজরুলের দোষ আবিষ্কার করা যায়, পরিণতিহীন প্রকরণগতভাবে দুর্বল, আবেগের আতিশয্যে বাঁধনহারা ভাব প্রভৃতি প্রায়ই তাঁকে কাব্যধর্ম থেকে স্খলিত করেছে। তবু তিনি উল্লেখযোগ্য একটিমাত্র কারণে। সেটা হল—তিনি রবীন্দ্রনাথে সংলগ্ন বা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি ; নিঃসন্দেহে প্রতিভায় দীন ক্ষুদ্র কবি, কিন্তু নতুন কবি, তাই মৌলিক কবি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মালমশলা নজরুলের মালমশলা নয়। নজরুলের কাব্যে সাহিত্যিক খোরাক অপেক্ষা উত্তেজনা ছিল বেশি ; তবু রবীন্দ্রনাথের পর তিনি বাংলা কাব্যে নতুন যৌবনের দূত। তিনি প্রমাণ করলেন যে রবীন্দ্রনাথের আলোকবর্তিকা ব্যতীত পথ চলা সম্ভব। এই যে নতুনের আকাঙ্ক্ষা নজরুল জাগালেন, তাতেই বাংলা কাব্যে প্রাণের সাড়া জাগল। এলেন মোহিতলাল, এলেন যতীন্দ্রনাথ। এঁদের এইসব বিধর্মিতার পথ বেয়ে, নবীন পরীক্ষার পথ বেয়ে 'কল্লোলে'র কোলাহল জেগে উঠল। শুরু হল নতুন পথে যাত্রা।

নজরুল যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিলেন, সেই বিদ্রোহ দু'হাত ভরে গ্রহণ করল 'কল্লোল'। আর সে বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। 'কল্লোলে'র কবিদের মনে হল—রবীন্দ্রনাথে বাস্তবের ঘনিষ্ঠ প্রকাশ নেই, নেই সংরাগের তীব্রতা, যন্ত্রণাজীর্ণ জীবন যেন উপেক্ষিত তাঁর কাব্যে, রবীন্দ্র জীবনদর্শনে অন্যায্যভাবে মানুষের শরীর উপেক্ষিত। এই বিদ্রোহে আদিখ্যেতা ও আবিলতার মধ্যেও যেটুকু সত্য ছিল তা হল—রবীন্দ্রনাথকে বোঝা এবং তাঁর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রয়াস। তৎকালে এ বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন দু'দিক থেকে, প্রথমত—রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বাংলাকাব্যের মুক্তির জন্য ; দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে যথার্থরূপে উপলব্ধি করার জন্য। অন্তত সেই বিদ্রোহের, সেই আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন যাঁরা, তাঁরা গভীরভাবে রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদ করতেন, মুগ্ধ হতেন, শিক্ষা নিতেন, কিন্তু

কবিতা চর্চার সময় রবীন্দ্রপন্থা পরিহারের আপ্রাণ প্রয়াস করতেন। বুদ্ধদেব বসুর কথায়—"নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—রবীন্দ্রনাথের প্যারোডি হবে না ব্যর্থ নকল হবে না—এই ইচ্ছার প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে সেদিন দূরত্ব বজায় রাখার দরকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় বলেছিলেন—ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাস দেবো। এটা 'কল্লোল'গোষ্ঠীর কবিদের উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। যথার্থই ফজলি আম ফুরোবার পর চালান দেওয়া মাদ্রাজি আম বা ফুটি, জামপিনের মতো আম্রগন্ধী সিরাপের চাইতে ঢের ঢের ভাল ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতা। যেমন ভাল মধুসূদনের পর 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের পর হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য না হয়ে একটি বৃহৎ পদ্যগদায় পরিণত হয়েছে। এটাও তো নাবালকত্বের লক্ষণ। 'কল্লোলে'র কবিরা এই নাবালকত্ব ঘোচাতে চেয়েছিলেন। পেরেছিলেন কিনা সেটা ভিন্নতর আলোচনার বিষয়। কিন্তু 'কল্লোলে'র অতি কোলাহলের পর 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের হাতে একটা সুচিন্তিত স্থিতিলাভের সচেতন প্রয়াস দেখা দিল। নজরুলের চড়া সুরের পর এল প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্যভাব। এরপর জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতির কাব্যে দেখা দিল সংহতি, বুদ্ধির দীপ্তি, বিষয় ও শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্যপদ্যের মিলন সাধনের সংকেত। কিন্তু এইসব কবিদের একের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই। তবু এঁরা সকলে মিলে নানাদিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন। অর্থাৎ এঁদের লেখা ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। কেমন করে রবিতাপ থেকে দূরে থাকবেন সে প্রচেষ্টাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করে আপন শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস। পিতার সম্পত্তির ওপর পুত্রের অধিকার থাকে, কিন্তু পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির শুধুমাত্র অপচয় করে বা শুধুমাত্র ভোগ করে, তাহলে পুত্রের নিজস্বতা কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে তাকে আপন শক্তিতে ও আপন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে আরো বাড়িয়ে তোলে, তবেই তার স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র কবিগোষ্ঠী সবদিক থেকে রবীন্দ্রনাথেই লগ্ন ও মগ্ন ছিলেন এবং তারই চর্বিত চর্বণ বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়ে গেছেন। কিন্তু নজরুল পরবর্তী কবিগোষ্ঠী, গাছ যেমন রবিরশ্মিকে নিজ শরীরে ধারণ করে, তাকে নিজের করে নেয়, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে, গ্রহণ করে, ঋণ নিয়েও উৎকৃষ্ট ও মৌলিক কবি হয়ে উঠলেন। বুদ্ধদেবের ভাষাতেই বলি—"সত্যেন্দ্রগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন

নিজেরা তা না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে ; আর এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সঙ্কোচ করেন না, কখনো কখনো আস্ত আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ।" সত্যেন্দ্রগোষ্ঠী চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বাংলা কাব্যে। তাঁদের কাব্যের জন্যে নয়, রবীন্দ্রপ্রভাবকে অঙ্গে ধারণ করে ভাবীকালকে সাবধান করবার জন্যে। বাংলা কবিতার এক সংকটের সময় এঁরা আত্মদান করে উত্তরকালকে নিষ্কণ্ঠক করে গেছেন বলে। তবে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ পার করে যে কবিরা আসছেন বা আসবেন, তাঁদের আর কোন বিপদ রইল না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা দূরে থাকলেন। তবে জীবনানন্দের আবর্ত বা বিষ্ণু দের আবর্ত—এরকম ছোট ছোট বিপদের সম্ভাবনা নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। এমন চিরকালই হয়, আবার তা কেটেও যায়। "পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোসা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে।" নতুন কবিদের মধ্যে টেকনিক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ততা দেখা যায়। যেটা সুলক্ষণ নয়। কেননা, ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা কাব্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাদোষ হলে তা অন্তরের দিক থেকে দেউলে হবার লক্ষণ। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে ভাব ও প্রকাশ ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ আজকের কবিদের সহায় হতে পারেন। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি যে অসম্ভব, সেটাও বুদ্ধদেব বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকে 'আদি উৎস' বলেছেন বুদ্ধদেব। আরো বলেছেন—"বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে মাংসে মিশে আছেন", শুধু তাই নয়, "তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনে নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে।"—এইসব থেকে বোঝা যায় লেখক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সমালোচনার শেষটিও অপূর্ব রবীন্দ্র প্রশস্তিতে ভরে উঠেছে—"রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁর ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী বাঙালি কবিকে ;" রবীন্দ্রনাথ যেন "সব পেয়েছির দেশ"—যেখানে যুগের পর যুগ মানুষ আসবে, উপকরণ সংগ্রহ করবে, কবিতা রচনা করবে। সমালোচকের শেষ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য—"এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত

আছে।'' কোনখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপের ইঙ্গিত আছে? ''তাঁর ভিত্তির ওপর বেড়ে উঠতে হবে আগামীকালের বাঙালি কবিকে,''— এই বক্তব্যের উপর বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপের ইঙ্গিত আছে বলে বুদ্ধদেব মনে করেন। আজকের কবিরা কূলহারা নাবিকের মতো উথালপাথাল জীবনসমুদ্রে দিশাহারা। তাদের চোখে রবীন্দ্রনাথই ''সবুজ ঘাসের দেশ'' 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'। দিশাহারা আজকের কবিকুলের কাছে রবীন্দ্রনাথ কম্পাসের কাজ করবেন, তাদের দিশা বা নিশানা ঠিক করে দেবার জন্য। সমালোচক বুদ্ধদেব একাধারে কবিও বটে। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এক কবির দ্বারা আর এক কবির মূল্যায়ন। সমস্ত আলোচনাতে রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় গভীর রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও কোথাও সে আলোচনা বক্রোক্তির তির্যক ব্যঞ্জনায় আরও আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে ; কোথাও ব্যাজস্তুতির বিদ্যুৎবিকাশ আমাদের চিত্তকে আলো ঝলমল করে তোলে। এক বিশেষ যুগের বাঙালি কবিদের ঐতিহাসিক স্বরূপ-সন্ধানে বুদ্ধদেবের সুচিন্তিত ভাবনা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ। কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধানম্র সত্য মূল্যায়নও আমাদের বিস্মিত করে।